..পরান সখা, বন্ধু হে আমার

অদৃশ্য স্পর্শে ছুঁয়ে যান তিনি। দিবসের মুগ্ধতা, রাত্রির কান্না—দৃষ্টির কাছে জানলার বাইরে—আকাশ আবার কখনো বৃষ্টি হয়ে—আলাপ জুড়ে দেন। এ জীবন থেকে আগত অনেক অনেক জীবন, তিনিই গোপন ডানায় ভেসে ভেসে পুরোনো বন্ধু। যত সঞ্চয় দিগন্তব্যাপী ধানে, যত রঙ আকাশে, নদীর জলে, যত প্রাণ বেদনার গভীরে তাকে বিপরীতে কিম্বা বিপ্রতীপে এনে—তিনিই যে বলেন—'কোনো বাঁধন নাহি মানি'। তবু মুহূর্ত সুতোর টানে—হৃদয়ের সকল দরজা খোলে—আশাবরী রাগে। বৈশাখে তিনি বসত করেন অনন্য আসনে। দেড়শো বছরের জন্মদিন—অনন্ত প্রাণাবেগে ভাসিয়ে দিল এপার-ওপার বাংলা। কত ভাবে—কত উচ্ছ্বাসে আমরা গাইলাম গান। তবু যেন মনে হয় কোথায় যেন কিছুমাত্র কম হয়ে গেল। দেড়শোটা বছর তবু অনন্ত নয়। মনে হয় এক অনন্ত জীবনেরই পাঠ—তিনিই অনন্ত যৌবন উৎসব।

তিনি ঋষি, তিনি গু(দেব। তিনিই রবীন্দ্রনাথ। সার্ধজন্মশতবর্ষে তাঁকেই স্মরণ—ছবিতে, কবিতায়, গদ্যে—। আর তাঁর কাছেই নীরব দাবী—

'....হৃদয় আমার চায়-যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার
যা কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো,
দাও গো আমার হাতে,
ধরবো তারে, ভরবো তারে,
রাখবো তারে সাথে—
একলা পথের চলা আমার
করবো রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।।'

রূপসী কাশ্মীর

শ্রীগণেশ চন্দ্র দত্ত

জেলা অবর-নিবন্ধক, কোচবিহার

ব্যাপক জঙ্গী কার্যকলাপের ভয়-ভীতিতে, ভ্রমরপিপাসুরা প্রায় এক যুগ কাশ্মীরের সৌন্দর্যদর্শনে বিরত ছিলেন। বর্তমানে সেসব অনেকটাই প্রশমিত। প্রশাসনের সদা সতর্ক নজর সর্বত্র চোখে পড়ে। আবার শুরু হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে দর্শনার্থীদের আনাগোনা। যদিও তারই মধ্যে অমরনাথ শিবলিঙ্গ দর্শনে ভাটা পড়েনি। LTC-এর আনুকুল্যে ২০১১-র পূজোর ছুটিতে সপরিবার রওনা দিয়েছিলাম ভূস্বর্গের আস্বাদনে। কাশ্মীর ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ সময় অক্টোবরের প্রথম তিন সপ্তাহ। এবাদেও অনেকে যান কাশ্মীরে বরফের খোঁজে। ভারতীয় রেলপথ জম্মুতেই ইতি (শ্রীনগর অবধি কিছুপথ সংক্ষেপ করে রেলপথ তৈরীর কাজ জোর কদমে চলছে)। তারপর বায়ুপথে ৭৫ মিনিট অথবা, সড়ক পথে ৩০০কিমি প্রায় ১০/১২ ঘন্টায় শ্রীনগর তথা জম্মুকাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী (শীতকালে জম্মুতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়)। সড়ক পথ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে ভরা। অনেকগুলো পাহাড়িপথ ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে আবার নামছে। চলার যেন শেষ নেই। যাবার সময় সড়কপথে গেলেও, ফেরাটা বায়ুপথে হলেই ভালো হয়। তবে, বিমানের টিকিটটা বুঝেশুনে অনেক আগে থেকে করা উচিৎ। আমার বন্ধু তৎকালীন কোচবিহারের জেলা নিবন্ধক শ্রী নিতাই চরণ মাকর-এর ভাই কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবিভাগে কর্মরত ছিলেন। তাঁর সাথে অনেকবার টেলিফোনে কথা বলে, কাশ্মীরের সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে নিয়ে তবেই রওনা হয়েছিলাম। জওহর সুড়ঙ্গ অবধি সারাটা পথ চড়াই উৎরাই। কিন্তু তারপরই একদম সমতল। শ্রীনগর আসলে এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা (ভ্যালী)। যথারীতি চাষবাস, বসবাস বহাল তবিয়তে চলছে। কাশ্মীরের সৌন্দর্য অপরূপ। এখানেই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্ত পরিষ্কার বোঝা যায়। গ্রীষ্মে ৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস, আবার শীতে মাইনাস ৫ সেলসিয়াস (কারগিলে মাইনাস২০—৪০ হয়ে যায়।) বৃষ্টিও হয় প্রচুর। কাশ্মীরিদের স্থানীয় ভাষা সংস্কৃত, পাঞ্জাবী ও ফার্সী মিশ্রিত ডোগরীভাষা। রাজতরঙ্গিনীতে পাওয়া যায় সম্রাট অশোক ধর্মযাত্রায় বেরিয়ে শ্রীনগরের ডাললেকের পাড়ে এসে পৌঁছান। কন্যা চারুমতী ডালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। গড়ে ওঠে বিহার আর জনপদ। চারদিকে পীরপ্রাঞ্জল গিরিশ্রেণী ঘিরে রেখেছে শ্রীনগরকে—নৈসর্গিক শোভা মনে ধরে রাখার মতো। রাখার মতো। রামায়ণ মহাভারতে কাশ্মীরের প্রসঙ্গ মেলে। এখানে মৌর্যরাজ অশোক, কুষাণরাজ কণিষ্ক, সুলতান বংশ, মোগল বংশ, মোগল বংশ, ব্রিটিশরা, শিখরা এবং ডোগরীরা বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করেছেন। সম্রাট শাহজাহান, জাহাঙ্গীর গড়ে তুলেছিলেন তাদের গ্রীষ্মাবাস। তারই চিহ্নস্বরূপ গড়েছেন নানান মনোরম উদ্যান, যথা—চশমাশাহী, নিশাতবাগ, শালিমার বাগ, নাসিমবাগ ইত্যাদি। শ্রীনগর যাবার পথে ভেরীনাগ। চশমাশাহীর প্রাকৃতিক প্রস্রবণের জল অনেকেই সংগ্রহ করছে এবং পান করছে। আমরাও কয়েক বোতল ভরে নিয়ে কয়েকদিন ধরে পান করেছি। সুমিষ্ট আস্বাদ খনিজ পদার্থ মিশ্রিত। জনশ্রুতি নেহরুজী নিয়মিত এর জলপানি করতেন। এই জলে অনেক ব্যাধির নাকি আরাম মেলে। কাশ্মীরের হৃদয়ের রাণী হল ডাল লেক। ডাল লেক, বড়া লেক আর নাগিনলেক মিলে ডাললেকের বিশাল ব্যাপ্তি। একদিকে বুলেভার্ড রোড, অপরপাড়ে সারি সারি প্রায় হাজারখানেক হাউসবোর্ট সাজানো। এই দেখে অনেকে একে পাশ্চাত্যের ভেনিস বলে থাকেন। ডাললেকে রয়েছে বাসমান চাষ/শব্জীক্ষেত্র, রয়েছে সুদৃশ্য নেহরু পার্ক। ডালে চলছে অসংখ্য শিকারা। এই শিকারা বিহারের তুলনা নাই। চলতে চলতে অনেক বাণিজ্য শিকারীর নাগালে পড়তে হয়। এখানেই রয়েছে বড় বড় বোটে বিভিন্ন দোকান পসরা। শাল শাড়ীর বাহার। হাউস বোটে রাত্রিবাস এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। তবে সব বুঝে শুনে মনে হয়, হাউসবোটে না থাকাটাই উচিৎ। কারণ, হাজার হাজার যাত্রীর এবং বোটে বসবাসকারী কাশ্মিরীদের মল-মূত্র যুগযুগধরে সবই ডালের জলেই নিমজ্জিত হচ্ছে এবং ঐ জলেই স্নান, মুখধোয়া, বাসনসাজা সবই হচ্ছে (রান্না ও খাবার জলের ব্যবহার সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে)। তবে, এসব চিন্তা করেও আমরা মাত্র একরাত বোটে ছিলাম, শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। শ্রীনগরে নগরীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান-শঙ্করাচার্য মন্দির, ২৪২ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে মন্দির দর্শন করতে হয়। এখানে বসে শঙ্করাচার্য

তপস্যা করেছিলেন। উপর থেকে নগরী এবং ডাললেক-সে এক সুন্দর দৃশ্য, দূরে বরফে ঢাকা পীরপাণ্ডালের গিরিশৃঙ্গ। তারপর রয়েছে মোগল সম্রাটদের তৈরী বিভিন্ন মনোরমউদ্যান। আর রয়েছে ডাললেকে শিকারা চেপে জলবিহার—এক সারা জীবনের সঞ্চয়। বহু সিনেমা/টি-ভি সিরিয়ালের শুটিং হয়েছে ডালে। কাশ্মীর ভ্রমণে হোটেল, গাড়ী, খাওয়া, বেড়ানো ইত্যাদি মিলিয়ে বেশভাল খরচ হয়। তিন-চারজনের পরিবার, ১৪/১৫ দিন বেড়ালে, সবমিলিয়ে লাখখানেক হলে ভালো হয়। জলে জল বিহারের মধ্যেই সন্ধান মেলে কাশ্মীরের শাড়ী, শাল মধু, কেশর ও শুপনো ফল। দাম কম নেই। দাম, গুণ ও মান বুঝেই কেনা যেতে পারে। বুলেভার্ড রোডে রয়েছে সব অভিজাত নামকরা দামী হোলেন। আমরা ছিলাম কোহনা ডালগেট এলাকার শেষের দিকে কোলকাতার মানুষ শ্রী সমর চক্রবর্ত্তী পরিচালিত এক নিখাদ বাঙালি হোটেলে। খাওয়া —থাকা সবই মেলে এখানে। বাঙালি নামের লেবেল সেঁটে কেউ কেউ বযবসা করছেন। তবে সেগুলোর গুণগতমান সম্পর্কে সন্দেহ আছে। শবনম, ক্যাথে, সাহারা এসব নামে একই জায়গায় সমরবাবু হোটেল চালাচ্ছেন। আদর আপ্যায়ণ খাওয়া থাকা সত্যিই অতুলনীয়। বেড-টী থেকে শুরু করে লুচি। মিষ্টি ছোলার ডাল। মাছ-মাংস, রাতের খাবার সব পাওয়া যায়। আমিস, নিরামিষ, রাতে রুটি যে যেরকম চায়। বেড়াতে গেলে দুপুরের খাবার প্যাক করে দিতেও ভুলে যান না। এখানে থাকতে হলে ৪/৫ মাস আগে থেকে যোগাযোগ করলে ভালে হয়। ফোন নম্বর ০৯৫৯৬৫৩৭২১০ অথবা ০৯৪৩৩০২৮৩৬৭। কোলকাতার ছেলে বিগত ৩০ বছর ধরে সুনামের সাথে কাশ্মীরিদের সম্পত্তি লীজ নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কাশ্মীরিরা বাদে কেউ এখানে জমি বাড়ী কিনতে পারেনা। আর রয়েছে হজরত মহম্মদের কেশ রক্ষিত পবিত্র হজরতবাল মসজিদ। মসজিদের ভেতরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই। সারা শ্রীনগর জুড়ে রয়েছে চিনারবৃক্ষ—এটি পারস্যদেশ থেকে আনা হয়েছিল। আর রয়েছে লক্ষাধিক টিউলিপ ফুলের বাগান—যা বছরে একবারই মার্চ মাসে মাত্র ১৫/২০ দিনের জন্য দেখা যায়। শ্রীনগরের বেকারীতৈরী খারাপ নামকরা, যেমন—রুটি, টোস্ট, লাভাস, কুলচা ও বাখরখানি বিখ্যাত। এছাড়াও নানান মিষ্টি জাতীয় খাববারও পাওয়া যায়। এখানকার "জান-বেকারী" প্রসিদ্ধ। একটি প্রচারিত দর্শনীয় স্থান রয়েছে— যার নাম "রোজাবল"। এটি একটি সমাধিমন্দির। কাশ্মীরিদের মতে এটি "ইউসা আসফ"—এর সমাধি স্থল। কিন্তু ঐতিহাসিক নাদিরীর মতে এটি আসলে যীশুখৃষ্টের সমাধিস্থল। তাঁর মতে ক্রুশবিদ্ধ হবার পর যীশুর মৃত্যু হয়নি। তাঁর রেজারেকশন হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেছিলেন। শত্রুর ভয়ে প্যালেস্তাইন থেকে ছদ্মবেশে গোপনে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে লাডাক হয়ে কাশ্মীরে আসেন এবং জীবনের ২/৩ অংশ এখানেই ছিলেন। বিস্তারিত জানতে শঙ্কুমহারাজ লিখিত হিমালয় ৩য় খণ্ড পড়তে হবে। শ্রীনগরকে কেন্দ্র করে দর্শনীয় স্থানগুলো সবই দেখে নেয়া যায়। বেড়াবার জন্য CAR বুকিং হয়। বাড়া হাজার তিনেকের মধ্যে প্রতি ক্ষেত্রে। এছাড়াও সরকারী বাস রয়েছে। তবে সবই অগ্রিমবুকিং করতে হয়। জম্মু থেকে শ্রীনগর গাড়ীভাড়া ৫/৭ হাজার টাকা। গাড়ীর এসোসিয়েসন ভাড়া নির্ধারণ করে থাকে। তবে অনেক সময় একটু কমেও হয়ে যায়। পরের দিকে সিন্ধু, ঝিলম ও লিডার নদীর সৌন্দর্য অতুলনীয়। আমরা প্রথমে দূরে যাই সোনমার্গ। এখানেই নয়ন মুগ্ধ কর খাজিয়োর গ্লোসিয়ার। যার সৌন্দর্য ভোলার মত নয়। অনেকটা কাছ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। অনেকে পাগলের মতো ছুটে চলেছে ছুঁয়ে দেখার জন্য। এখান থেকে অমরনাথ দর্শনে যাবার পথ আছে। সোনমার্গ যাবার রাস্তায় প্রথমবার দেখতে পেলাম আপেল বাগান। অনেকেই গাড়ী থেকে নেমে ছবি তুলছে। আপেল কিনছে এবং খাচ্ছেও। কাশ্মীরে অনেক আপেল বাগানে গিয়ে আপেল খেয়েছি। কিন্তু এখানকার বাগানের আপেলের স্বাদ এতটাই মিষ্টি ও রসালো, যে না খেলে শুধু লিখে বোঝানো যায় না। আমাদের সাধারণ বাজারেও এই আপেল দেখা যায় না। গাছ থেকে সদ্য পেড়ে দেয়া আপেল সত্যিই স্বর্গীয় ও অনবদ্য। বন্দুকহাতে বাগানে পাহারা চলছে, কাউকেই অনেক অনুরোধ সত্বেও ঢুকতে দেয়া হল না। তবে, অন্য জায়গায় ২/৩টা বাগানে ঢুকে আপেল খেয়েছি—হাত দিয়ে ধরে ছবিও তুলেছি। এরপর গেলাম গুলমার্গ। পাহাড় আর পপলারে ঘেরা। সারা কাশ্মীরে সরলবর্গীয় বৃক্ষেরই প্রাধান্য। গুলমার্গেই রয়েছে এশিয়ার দীর্ঘ ও বিশ্বের উচ্চতম কেবল্‌কার। শীতকালে এখানে বরফের উপর স্কেটিং করা যায় ও স্লেজগাড়ী চলে। শ্রীনগর থেকে ২২ কিমি দূরে রয়েছে হিন্দুদের মন্দির ক্ষীরভবানী। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ পূজো দিয়েছিলেন। কাশ্মীরের উল্লেখযোগ্য নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ডুব দেবার মত অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান হল পহেলগাও। যাবার পথে লিডার নদীর যাত্রাপথ নজরে পড়ে। এখান থেকে অমরনাথ যাবার রাস্তা আছে। তবে সেটা রাস্তা বলা ভুল। অসম্ভব দুর্গম পাহাড়ী পায়ে চলা পথ আাছে। এখান থেকেই বৈশরণ যাওয়া যায়। যাওয়া যায় মিনি সুইজারল্যান্ডে। পাহাড়ে ঘেরা সবুজ উপত্যকা, প্রাকৃতিক শোভায় ভরপুর। ঘোড়ায়চড়ে যাওয়াটা

অতীব রোমাঞ্চকর। আর বারবারই ভয়ে বুক কাঁপে। ঘোড়াগুলো কেন যেন কঠিন এবড়ো খেবড়ো পতেদ্দর খাঁজ ভাঁজগুলোকেই বেছে নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। অনেকে ভয়ে চীৎকার করে। পহেলগাও যাত্রাপথে দেখা মিলবে পামপুর। এখানে ডাফরান চাষ হয়। কেশর উৎপাদন বিশ্বে দুনম্বর। প্রথম স্পেন। অক্টোবর মাসে জাফরান ফুল ফোটে। এর অপরূপ শোভায় মুগ্ধ হতেই হবে।

রবীন্দ্র মননে পদ্মা

বিভূতিভূষণ মণ্ডল
এ. ডি. এস. আর, বালুরঘাট

'' Rivers are like mothers for the country, and mountains like the father. This father is a magnanimous thoughtful resolute archaic man and the rivers are conscious liberators, swift and Source of Knowledge....."

—Kalidasa in Raghuvansham

বাংলাদেশে নদীনালা, খালবিল, পুকুর ডোবার দেশ। নদীমাতৃক এই বঙ্গদেশের উপর দিয়ে শুধুমাত্র গঙ্গা-পদ্মা নয়, আরো যে কত নদ-নদী বয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই যুগ যুগ ধরে বাঙালীর মানস ও জীবনচর্চায় নদীর প্রভাব যেমন গভীরভাবে পড়েছে তেমন অন্য কিছুতে নয়। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন।

বাংলা সাহিত্য নামক নন্দন কাননটিতে পারিজাত নামক ফুল সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি কবি, কবিদেরও কবি। মহাকবি। অন্য সব মহাকবিদের ন্যায় ও তিনি কোন এক বিশিষ্ট ভূ-খন্ডের সন্তান। যেমন-সেক্সপীয়রকে বলা হয় Bard of Avon। তাঁর কর্মজীবন কেটেছে লন্ডনে কিন্তু নাট্য শিল্পের সঙ্কীর্ণ সুযোগে বারে বারে তিনি Avon নদীতীরস্থ জন্মপল্লী Stratford কে আর তার নরনারীকে চিত্রায়িত করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বলা হয় Lake poet। তিনিও তাঁর Lake Districtকে অবাধে অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে খানিকটা ব্যতিক্রম আছে। জন্মেছিলেন তিনি কলকাতায়। কিন্তু কলকাতা থেকে দূরে পদ্মাপারের শিলাইদহে তিনি কাটিয়েছিলেন তাঁর জীবনের সফলতম দশটি বছর ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত। সেই বিশেষ ভূখণ্ডটিকে তিনি তুলে ধরেছেন তার সাহিত্যে—কাব্যে, গানে, গল্পে বহু বিচিত্রভাবে।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন। কিন্তু জমিদারী মেজাজটা ছিল না তাঁর। পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে তিনি জমিদারী দেখতে এসেছিলেন। এখানে তিনি যা পেলেন, যা দেখলেন এবং যা লিখলেন তার মূল্য যে কত তাতো ব্যাখ্যা করা যায় না কোনভাবেই—না বলে না লিখে।

রবীন্দ্রনাথ কবি। তিনি পদ্মাকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। পদ্মাকে জেনেছেন বুঝেছেন। পদ্মাকে দেখেছেন—জেনেছেন- বুঝেছেন বলেই বাংলাদেশের মা-মাটি-মানুষকে দেখেছেন—জেনেছেন বুঝেছেন। তার প্রকাশও ঘটিয়েছেন অনুপমভাবে।".....নদীর জল অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, কোথাও এক কোমরের বেশী জল আর প্রায় নেই। তাই বোটটাকে নদীর প্রায় মাঝখানে বেঁধে রাখা কিছুই শক্ত হয়নি। আমার ডানদিকের পারে চরের উপর চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গোরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার বাম পারে শিলাইদহের নারকেল এবং আমবাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙ্গাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে, যারা অল্পবয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না। একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে, আবার ঝুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদের নিশ্চিন্ত, উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে। পুরুষরা গম্ভীরভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে চলে যায়—কিন্তু মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশীভাব, পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং গাড়ত্ব আছে। জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছলছল জ্বলজ্বল করতে থাকে—একটা বেশ সহজগতি ছন্দ তরঙ্গ দুঃখ তাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙ্গে যায় না। সমস্ত কঠিন পৃথিবীকে সে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে আছে। পৃথিবী তার অন্তরের গভীর রহস্য বুঝতে পারে না। সে নিজে শস্য উৎপাদন করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে না থাকলে পৃথিবীতে একটা ঘাসও গজাতে পারত না। মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে টেনিসন বলেছেন, Water unto wine। আমার আজকের মনে হচ্ছে জল unto স্থল। তাই জন্য মেয়েতে

ও জলেতে বেশ মিশে যায়। অন্য অনেকরকম ভারবাহন মেয়েতে শোভা পায় না; কিন্তু উৎস থেকে, ঘাট থেকে, কুয়ো থেকে, জল তুলে নিয়ে যাওয়া কোনো কালেই মেয়েদের পক্ষে অসংগত মনে হয় না। স্নান করা, গা ধোওয়া, পুকুরের ঘাটে এক কোমর জলে বসে পরস্পর গল্প করা, এসমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভন.....”।

বাস্তব ও জল্পনার এরকম অনুপম মিশেল ছিন্নপত্রাবলীতে পাওয়া আয়াসসাধ্য মোটেই নয়। আরো উল্লেখে তার পরিস্ফুটন শ্রীমন্দিত হবে সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

সাতাশে পড়ার আনন্দে বিহ্বল কবি বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন ছিন্নপত্রের একটি পত্রে যে তিনি কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। ত্রিশ সম্বন্ধে কবির মনে ছিল এক উচ্চস্তরীয় ধারনা। বন্ধুকে তিনি লিখেছেন—‘ত্রিশ অর্থাৎ ঝুনো অবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে—কিন্তু শস্যের সম্ভাবনা কই? এখনো মাথা নাড়া দিলে মাথার মধ্যে রস থল থল করে—কই তত্ত্বজ্ঞান কই? লোকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছে তোমার কাছে যা আশা করছি তা কই?’ কবির শিলাইদহের দশকটিতেই তাঁর সে আশঙ্কা মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছিল, রসিকজনের প্রত্যাশাও বহুগুণে পরিতৃপ্তি করেছিল। এখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সালে। এখানে অবস্থান কালে তিনি পদ্মার রূপমাধুরি পান করেছেন। পদ্মার স্নেহ মমতা , ভালবাসা-প্রীতির দ্বারা তিনি লালিত পালিত হয়ে কাব্যে, গানে, গল্পে সেই ঋণ শোধ করে দেবার চেষ্টা করেছেন। আমার কাছে মনে হয় এটি পদ্মার দশক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে চিহ্নিত হলেও অত্যুক্তি হবে না। এ দশকের মূল্যায়ন ভাবতে গিয়ে বিদগ্ধ রবীন্দ্রসমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

“তৃতীয় দশকের শেষে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে অন্যতম বাঙ্গালী কবি রূপে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতেন সন্দেহ নেই তবে সম্ভাবিতের চেয়ে সম্ভাবনার উপরেই জোর দিয়েই দাবী করতে হয়। আর চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটলে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক কবিরূপে তাঁর স্থান স্থিরীকৃত হত।”

চতুর্থ দশকে রবীন্দ্রনাথ কালি-কলমের সম্মিলনে যে সোনার ফসল ফলালেন তা অতুলনীয়। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, কনিকা, কল্পনা, কথা, নৈবেদ্য, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, গান্ধারীর আবেদন, বিদায় অভিশাপ, কর্ণকুন্তী সংবাদ, নরকবাস, সতী, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, এছাড়াও রয়েছে ছিন্নপত্রাবলী, অনেকগুলো ছোটগল্প।

রবীন্দ্রনাথ একবার দেখেছিলেন পদ্মার ঘাটে একটি বার-তের বছরের মেয়েকে নৌকা করে বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো হয়েছিল। তার ছোটবোন সঙ্গে। ছোট মেয়েটির দুচোখে জল। দিদিকে হারাতে তার মন চায় না। কারণ দিদি তার পুতুল খেলার সাথী। তবুও দিদিকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দিতে তাকে অনুগামী হতে হয়। এরই প্রতিধ্বনি কি আমরা শুনতে পাই কবির সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের ‘যেতে নাহি দিব’ কবিতায়—

“এ অনন্ত চরা চরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন ‘যেতে নাহি দিব’। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।”

সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী কাব্যে প্রধান motif নদী, নৌকা ও মাঝি। প্রথম দুখানিতে বর্ষার ভরানদী, শেষেরখানিতে শীতান্তের নদী। বর্ষায় নদীটাই প্রধান, শীতান্তে প্রাধান্য পায় নদীতীরের গ্রামগুলি, আর সেই সঙ্গে কর্তিত শস্যপ্রান্তর।

রবীন্দ্রনাথ একবার চলনবিলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক সূর্যাস্তের সময় যখন তিনি একটি গ্রাম পেরুচ্ছিলেন তখন দেখতে পেলেন একটি লম্বা নৌকায় অনেকগুলি ছোকরা ঝপঝপ করে দাঁড় ফেলছে তার তালে তালে গাইছে—

“যোবতী ক্যান বা করো মন ভারী? পাবনা থেক্যে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।” রবীন্দ্রনাথ তা শুনে আফসোস করে লিখলেন— “.....আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা দিতে কিংবা নন্দনকানন থেকে পারিজাত এনে দিতে প্রস্তুত হই কিন্তু এ অঞ্চলের লোকে সুখে আছে বলতে হবে, অল্প ত্যাগ স্বীকারেই যুবতীর মন পায়।”

৯ই, ১০ই আশ্বিন, ১৩০৪ চলনবিলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঝড়ের মুখে কবি, টলমল বোট। যে কোন সময়ে ডুবে সলিল সমাধি হতে পারে। কবির পরোয়া নাই। অকুতোভয় কবি লিখে ফেললেন অসাধারণ প্রেমের গান যেমন—

(১) আমি চাহিতে এসেছি একখানা মালা
তব নবীন প্রভাতের নবীন শিশির ঢালা।

অথবা

(২) যদি বারণ কর তবে গাহিব না,
যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না।

অথবা

(৩) সখী প্রতিদিন এসে হায় ফিরে যায় কে।
তীরে আমার মাথার একটি কুসুমদে।

এ ভাবা যায়! শেষ করছি সেই বাংলা সাহিত্যের বিরাট মহীরুহ এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং পদ্মার প্রতি ঋণ স্বীকার করে।

ঋণস্বীকার ঃ—

(ক) ছিন্নপত্রাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ—প্রমথনাথ বিশী।

রবীন্দ্রনাথ—মরমে, মননে

সতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ. ডি. এস. আর., কৃষ্ণনগর (সদর) নদীয়া

"আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি"— কান্ত কবির এই পংক্তিটি দিয়েই শুরু করা যাক।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখার ব্যাপারে আমি অকৃতি তো বটেই হয়তো বা অধমেরও অধম। রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক কোন আলোচনা করার ধৃষ্টতা বা ক্ষমতা আমার নেই। ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে তাঁকে, তাঁর লেখাকে যে ভাবে অনুভব করি—সেই সম্বন্ধেই কিছু লিখি।

এই বিশ্বে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে আমরা জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড় বহুমুখী প্রতিভার আধার বোধ হয় খুব কমই জন্মেছেন।

প্রথমেই মনে হয় সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথ হলেন একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বা। কবিতা, গান, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক-নাটিকা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা শিশুসাহিত্য, পত্রসাহিত্য—সাহিত্যের সবরকম আঙ্গিকেই তাঁর অবাধ বিচরণ এবং তার মধ্যে অধিকাংশই কালজয়ী। না হলে, তাঁর জন্মের দেড়শত বছর পরেও—এখনও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর লেখা কবিতা আবৃত্তি হয়, গাওয়া হয় তাঁর গান।

'আজি হতে শতবর্ষ পরে/কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে.....।' বোধ হয় দ্বিশত বর্ষ পরেও মানুষ তার রচনা পাঠ করবে; শুনবে তাঁর গান।

গান—রবীন্দ্রনাথের গান—অজর, অমর, অক্ষয়। কবিগুরুর নিজের কথায়—তাঁর আর কিছু না থাকুক, গান টিকে থাকবে। শুধু টিকে যায়নি, বাঙালী জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে, বিভিন্ন আঙ্গিকে রবীন্দ্রগীতি আজও আমাদের স্পন্দিত করে। আমার মনে হয় আমাদের মস্তিষ্কে যে অজস্র ছোট ছোট কুঠুরী আছে, তার প্রত্যেকটির মধ্যে কোন না কোন রবীন্দ্রসংগীতের পংক্তি গেঁছে অছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি আবেগ, প্রতিটি অনুভূতির সময়ে—সে হর্ষ, বিষাদ, রাগ, দুঃখ যাই হোক —কোন না কোন রবীন্দ্রগীতির পংক্তি, আমাদের মনে আসে। আমি সাহিত্য বোদ্ধা নই। রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নিশ্চয়ই সবসময় আমার বোধ্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের কথা ও সুর —যা আমাদের পৌঁছে দেয় আনন্দ এবং উপভোগের চেয়েও উচ্চতর কোন অনুভূতিতে —সেটি অনুভব করতে তো বোদ্ধা হওয়ার দরকার হয় না।

রবীন্দ্র সাহিত্যের দু'- একটি অমর পংক্তির সম্বন্ধে আমার কিছু অনুভূতির কথা লিখি। ধরুন—

" আজ ছিল ডাল খালি, কাল ফুলে রায় ভরে" অথবা

" কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই" অথবা

"ভাল মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে"—

মনুষ্যজীবনের এই অমোঘ সত্যগুলো কবি কেমন সহজ ভাবে বলেছেন। আমার তো মনে হয় আপেল গাছ থেকে খসে উপর দিকে না গিয়ে কেন নীচে মাটিতে পড়ে—এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয় প্রথম যে রকম উপলব্ধি করেন স্যার আইজ্যাক নিউটন এবং আবিষ্কার করেন মহাকর্ষ বলের অস্তিত্ব। উপরের ঐ পংক্তিগুলিও এই উপলব্ধির সমতুল্য।

গাছের যে শাখা-প্রশাখা কালও খালি ছিল, সেগুলো আজই ফুলে ভরে গেছে—এ জিনিসতো আবহমান কাল থেকেই হয়ে আসছে।— আমরা সবাই জানি, সবাই দেখি। কিন্তু সেই জিনিস এত সহজ, সরলভাবে আর তো কেউ বলেননি। এবার ধরুন তৃতীয় পংক্তিটি। সত্যের যে কোন বাছ-বিচার হয় না, সে ভাল বা মন্দ যা-ই হোক —এতো আমরা সবাই জানি। সত্য হল অমোঘ, তার ওপরে আর কিছুই নেই। তাকে মেনে নিতেই হবে—এতো আমরা ছেলেবেলা থেকেই

জেনে আসছি। কিন্তু এত সহজ ও সুন্দর ভাবে এই গূঢ় তথ্য কবিগুরুই আমাদের বলেছেন।

শৈশবে বর্ণপরিচয়ের 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পেরিয়ে যেদিন কবিগুরুর সহজপাঠে ঢুকলাম—সেইদিন থেকে অদ্যাবধি কবিগুরু তাঁর বিভিন্ন গানে, কবিতায়, গল্পে আমাদের সামনে নিপুণভাবে যে সব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা বোধ হয় একমাত্র তাঁর সাহিত্যেই পাওয়া যায়।

শৈশবের সহজপাঠের 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে' বা 'ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি আছে আমাদের পাড়াখানি' শেষ করে গুটি গুটি পায়ে এসে পৌঁছেছিলাম তাঁর 'তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে' বা 'অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনি গাঁয়ে' কবিতাগুলিতে। তারপর একে একে এল—'সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত' বা 'অন্ধকার বনছায়ে সরস্বতী তীরে, অস্ত গিয়াছে সন্ধ্যাসূর্য' কবিতাগুলি। সেই সময় সেরকম করে নিশ্চয়ই ভাবিনি বা ভাবার বয়সও হয়নি; কিন্তু আজ মনে হয় যে ছবিগুলি প্রত্যেক কবিতাতে সুনিপুণভাবে কবি আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা আজও মনের গহন কোণে চির সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

এরপর এল গান—রবীন্দ্রনাথের গান। বাঙালী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি আবেগে, প্রতিটি অনুভবে, প্রতিটি মুহূর্তে যে গানের কথা ও সুর বাঙালীর মনে অনুরণিত হয়, বাঙালীকে প্রাণিত করে। ক্রিকেট ম্যাচে টসে জিতে অধিনায়কের কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ—সে বিষয়ে ক্রিকেটের জনক Sir W. G. Grace-র এক উক্তি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন—যদি টসে জেত আর দেখ ভাল পিচ, তবে চোখ বুঁজে ব্যাট কর। যদি দেখ পিচ খারাপ তবে ভাব আর শেষে ব্যাটই কর। আর যদি দেখ পিচ খুব খারাপ তবে ভাব, ভাব আবার ভাব আর শেষে ব্যাটিংই নাও।

আমার মনে হয়, আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা একদম এইরকম। মন যখন স্বাভাবিক তখনতো রবীন্দ্র কবিতা, রবীন্দ্রগীতি স্বাভাবিক ভাবেই মনের মাঝারে স্বতঃ অনুরণিত হয়। যখন মন খারাপ হয়, তখনও রবীন্দ্রগীতিই আমাদের পথ দেখায়। আর যখন কোন গভীর শোকে হৃদয় থাকে বিষন্ন ও ভারাক্রান্ত তখনও 'আগুনের পরশমণি' আমাদের প্রাণে ছুঁইয়ে রবীন্দ্রনাথই আমাদের জীবনকে পুণ্যময় করে তোলেন। আমারতো মনে হয়, দুঃখের সময়েই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মার একেবারে কাছে পৌঁছে যান। যে মানুষ সারাজীবনে এত দুঃখ পেয়েছেন— এত মৃত্যু ও বিচ্ছেদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেই বিষাদকে আত্মস্থ করে সৃষ্টি করেছেন অনুপম সাহিত্যের—তিনি ছাড়া দুঃখের দিনের আত্মীয় আর কে-ই বা হতে পারেন?

'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে,
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে'

দুঃখের সময় এর থেকে বড় সান্ত্বনার বাণী আর কি হতে পারে?

পরিশেষে রবীন্দ্র প্রতিভার আরও একটি দিকের কথা অবশ্য বলতে হয়—সেটি হল চিত্রশিল্প। তাঁর কিছু পাণ্ডুলিপি। তাঁর কিছু পাণ্ডুলিপিতে কিছু শৈল্পিক চিত্রকলা (Doodles) ছাড়া; রবীন্দ্রনাথ আঁকতে শুরু করেন প্রায় ৭০ বছর বয়স থেকে। সত্তরোর্ধ্ব একজন মানুষের শিল্প প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখে শিল্পরসিকরা আজও বিস্মিত হন। কবিগুরুতো কোনদিন ফরমায়েসি লেখা লেখেননি। তাঁর সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টিই ছিল এক বিশাল প্রতিভার স্বাভাবিক প্রকাশ। আমার মনে হয় এবং এটা একদমই আমার মনে হওয়া যে, যখন লেখার ভাষায় কবির আর নতুন করে কিছু দেওয়ার ছিল না, তখন তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন তুলি আর রঙ। আজ পৃথিবীর শিল্পরসিক জগৎ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে সেইসব অঙ্কনগুলি একদম তাঁর নিজস্ব ঘরানার এবং অবশ্যই রসোত্তীর্ণ ও কালজয়ী।

"আকাশ ভরা সূর্য তারা'-র মাঝখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে বাঙালীর সংস্কৃতির আকাশে চির বিরাজমান। যতদিন বাঙালীর শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি থাকবে—ততদিন রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর 'হিয়ার মাঝে' থেকে যাবেন। তিনি এমন এক বিশাল মহীরূহ—যাঁকে আপনার ভাল লাগতে পারে, আবার মন্দও লাগতে পারে কিন্তু জীবনের যে কোন মুহূর্তে আপনি তাঁকে অস্বীকার করতে পারবেন না। তাঁরই রচিত পংক্তি দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই লেখা শেষ করি—

'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।'